এবনে গোলাম সামাদ

রচনাসংগ্রহ ১

এবনে গোলাম সামাদ

রচনাসংগ্রহ ১

পরিবেশ

এবনে গোলাম সামাদ
রচনাসংগ্রহ ১

প্রকাশক	□	পরিলেখ ইউনিক প্যালেস (৭ম তলা) মির্জাপুর, মতিহার, রাজশাহী-৬২০৬ ঢাকা অফিস: ২৭, রাসেল সেন্টার হাটখোলা, ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩
প্রথম প্রকাশ	□	একুশে বইমেলা ২০২২
গ্রন্থস্বত্ব	□	লেখক
প্রচ্ছদ	□	মনিরুজ্জামান মনির
অক্ষরসজ্জা	□	আনোয়ার হোসেন এ্যাকটিভ কম্পিউটার, রাজশাহী
মুদ্রণ	□	মৌমিতা প্রিন্টিং প্রেস বাংলাবাজার, ঢাকা
মূল্য	□	আটশত টাকা মাত্র

Rochonasangraho 1 by Ebne Golam Samad
Published by Porilekh, Rajshahi-Dhaka, Cover: Moniruzzaman Monir
Date of Publication: February 2022, Price: 800 Taka only

প্রসঙ্গ কথা

নতুন এক বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে আমরা এবার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করলাম। পরিবর্তমান এই বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়া বা এর মোকাবেলায় আমাদের আশু কর্তব্য একটি স্বাধীন, স্বাবলম্বী ও মর্যাদাবান জাতি বিনির্মাণ করা। এর জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্রের চর্চা, আইনের শাসন, এবং সর্বোপরি জাতিসত্তার বিকাশ। বিগত অর্ধশত বছরে অগণতান্ত্রিক, কর্তৃত্ববাদী, বশংবদ ও দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতি, আত্মকলহ এবং সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব এতে বাধা সৃষ্টি করেছে। বিশেষত জাতিসত্তার বিকাশ দিশা হারিয়েছে বারবার। আমাদের বুদ্ধিজীবি সমাজ এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে শুধু যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন তাই নয়, বরং অধিকাংশ সময় তারা এসব অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ডের সক্রিয় অংশীদার হয়েছেন। তবে আশার কথা একেবারেই হাতে গোণা হলেও কয়েকজন বুদ্ধিজীবি এই বশংবদ বুদ্ধিবৃত্তিক স্রোতোধারার বাইরে থেকে জাতিকে লক্ষ্যাভিমুখী করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। প্রফেসর ড. এবনে গোলাম সামাদ এদের মধ্যে অন্যতম।

ড. সামাদ একজন বহুমাত্রিক জ্ঞানসাধক, আপসহীন বুদ্ধিজীবী এবং দেশপ্রেমিক লেখক। তিনি জ্ঞানতাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আমাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার পরিচয়কে তুলে ধরেছেন বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে। একজন সচেতন ও দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে স্বদেশের স্বার্থের প্রশ্নে আপসহীন ভূমিকা রেখেছেন সব সময়। তাঁর কলম বিচিত্র পথের অনুগামী হয়েছে। বিজ্ঞান, শিল্পকলা, দর্শন, নৃতত্ত্ব, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, সংস্কৃতি- সবক্ষেত্রেই তাঁর অবাধ ও স্বচ্ছন্দ বিচরণ। মানুষ ও স্বজাতির তীব্র কল্যাণচেতনায় তিনি ক্রমাগত চিন্তাশীলতা ও অনুসন্ধিৎসার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর জ্ঞানচর্চা ও লেখালেখির ক্ষেত্র বিচিত্র হলেও তার প্রধান অভিমুখ ছিল বৃহত্তর অর্থে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় অনুসন্ধান, উন্মোচন ও বিকাশ এবং বিশেষত স্বাধীন বাংলাদেশের স্বার্থ, স্বকীয়তা ও মর্যাদা অর্জন ও রক্ষার বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই। কিন্তু তিনি সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ বা সম্প্রদায়কেন্দ্রিক মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি সবকিছুকে দেখেছেন ও বিশ্লেষণ করেছেন বিজ্ঞানসম্মতভাবে।

যৌক্তিক, বৌদ্ধিক, ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, ভাষিক ও সাহিত্যিক মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে ড. সামাদ প্রমাণ দিয়েছেন বাঙালি মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অধিকারী। তার সংস্কৃতি ও নৃতত্ত্ব এবং উন্মেষ ও বিকাশে বহু জাতির মিশ্রণ ও ভূমিকা থাকলেও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় বাঙালি মুসলমান একক ও স্বাধীন সত্তায় উজ্জ্বল। তার আদর্শ,

বিশ্বাস, জীবনচেতনা, রীতি-নীতি, প্রকাশভঙ্গি, শিল্পচেতনা, সর্বোপরি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের একটা পৃথক ইতিবৃত্ত আছে। ফলে একটা আলাদা জনসমাজ গড়ে উঠেছে ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহৎ জনসমাজে। সে পথেই বাঙালি মুসলমানের জাতীয়তাবোধ ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ঘোষণার বাসনা জাগ্রত ও লালিত হয়েছে এবং তার থেকেই অভ্যুদয় ঘটেছে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের। অতএব এর অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই জাতীয়তাবোধের লালন ও বিকাশের ওপর। দেশপ্রেম এবং স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তির এমন সম্মিলন বাংলাদেশে বিরল। তাঁর এসব পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ছড়িয়ে আছে তাঁর অসংখ্য গ্রন্থ, প্রবন্ধ, কলাম এবং অন্যান্য রচনায়।

ড. সামাদের রচনাসম্ভার বিপুল এবং বিচিত্র। তাঁর কয়েকটি বই আমরা ইতোপূর্বে প্রকাশ করেছি। একটি 'নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ' প্রকাশের ব্যাপারেও আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি সম্মতি প্রদান করেছিলেন। আমরা কাজও শুরু করেছিলাম। ইতোমধ্যে ২০২১ সালের ১৫ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সকল মহল থেকে দাবি ওঠে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ এবং অগ্রন্থিত রচনাগুলো একত্র করে রচনাসমগ্র প্রকাশ করা হোক। এটা আমাদের জন্য একটি দুরূহ কাজ। তবুও আমরা উদ্যোগী হয়েছি প্রথমত ড. সামাদ এবং তাঁর শুভানুধ্যায়ী ও ভক্তদের আগ্রহকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য, এবং সর্বোপরি তাঁর রচনাবলী বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও মর্যাদাবান জাতি গঠনের লড়াইয়ে রসদ জোগাবে এই প্রত্যাশায়।

দীর্ঘকাল ধরে লেখা ড. সামাদের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বিপুল রচনাবলীর মধ্য থেকে বর্তমান 'রচনাসংগ্রহ ১'-এর জন্য আমরা বেছে নিয়েছি *বায়ান্ন থেকে একাত্তর*, *বাংলাদেশে ইসলাম* এবং *বাংলাদেশ: সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি প্রতিক্রিয়া এই* তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও বেশকিছু অগ্রন্থিত রচনা। এসব গ্রন্থ ও রচনার মধ্যে পাঠক ড. সামাদের গভীর জ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠা এবং দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠার পরিচয় পাবেন।

নাজিব ওয়াদুদ
প্রকাশক
পরিলেখ প্রকাশনী

সূ চি প ত্র

বায়ান্ন থেকে একাত্তর

১৩ বাংলাদেশে বাংলা ভাষা
১৯ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস
২৩ ভিন্ন প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন
৩৩ রাষ্ট্রভাষা নিয়ে আরও কিছু বাড়তি আলোচনা
৪০ রাজনীতিবিদ হিসেবে গোলাম আযম
৪৬ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪০ বছর পূর্তিতে বিশেষ ভাবনা
৫১ ১৯৭১-এর ইতিহাস নিয়ে রাজনীতি
৫৯ ১৯৭১-এর যুদ্ধ
৬৭ একাত্তরের দিনগুলি
৭২ মুজিবনগরের বাখানি
৭৯ ৭-ই মার্চের বিখ্যাত ভাষণ
৮৩ ইয়াহিয়ার একটি সাক্ষাৎকার
৮৫ সেইসব দিনের স্মৃতি ও বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি
৯৫ সিমলা চুক্তি ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার
১০০ ঊনিশশো একাত্তরের যুদ্ধে জ্যাকবের ভূমিকা
১০৬ যুদ্ধাপরাধের বিচার
১১৩ ভুলে যাওয়া জহির রায়হান
১১৭ বাহাত্তরের সংবিধানের পটভূমি
১২১ আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা
১২৭ ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর : একটি রাজনৈতিক পর্যালোচনা
১৩১ বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ
১৩৬ ইতিহাস নিয়ে কথা
১৪৬ বাংলার ইতিহাস সন্ধানে

বাংলাদেশে ইসলাম

১৫৫ বাঙালি মুসলমানের নৃ-পরিচয়
১৬৮ বাঙালি মুসলিম মানসের রূপরেখা ও রাষ্ট্র চেতনা
১৮১ বাংলার সমাজ-জীবনে ইসলাম
১৯৪ বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে মুসলিম উপাদান
২০৮ গ্রন্থপঞ্জি
২০৯ পরিশিষ্ট

বাংলাদেশ : সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি প্রতিক্রিয়া

২১৩ বাংলাদেশের নাম পরিচয়
২১৬ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আমাদের সংস্কৃতি
২২৪ সংস্কৃতির মানদণ্ড
২২৭ কলকাতার সংস্কৃতি
২৩১ দুই সংস্কৃতির সমস্যা
২৩৭ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শিক দ্বন্দ্ব
২৪১ বাঙালি জাতীয়তাবাদের গতি-প্রকৃতি
২৪৪ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও বাংলাদেশের মানুষ
২৪৮ সাম্প্রদায়িকতা
২৫৪ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ
২৫৭ 'মৌলবাদ' বিরোধী প্রচারণা ও ভারতের স্বার্থ
২৬০ কাশ্মীর সমস্যার পটভূমি
২৬৪ হটাও ফারাক্কা : তোমরাও বাঁচ আমাদেরও দাও বাঁচতে
২৬৯ কামতাপুর-এর আন্দোলন
২৭৩ বিপথগামী চাকমারা ভারতীয় আধিপত্যের বাহন
২৭৬ মানুষের ইতিহাস তার স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস
২৮০ বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি বিভ্রাট ও চক্রান্ত সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনছে
২৮৫ ইসলামকে বিবেচনা করতে হবে ইসলামের ধারায়
২৮৯ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ধর্ম ও রাজনীতি
২৯২ স্থিতিশীল গণতন্ত্রের জন্য ইসলামের ভিত্তি
২৯৬ ভারতে হিন্দু মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন
৩০১ মহারাষ্ট্রে 'দলিত' নির্যাতন
৩০৪ আমাদের নারী আন্দোলন পাশ্চাত্য থেকে শিক্ষা নিচ্ছে না

৩০৮ সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতিসত্তার সংঘাত
৩১১ মার্কসবাদের শবযাত্রা
৩১৬ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি : আমাদের বুদ্ধিজীবী মহলের মাতম
৩২১ মুক্তবাজার অর্থনীতি নয়, প্রয়োজন জাতীয়তাবাদী অর্থনীতি
৩২৪ 'আদিবাসী' শব্দের অপপ্রয়োগ হচ্ছে
৩২৭ দুর্ভিক্ষ, অমর্ত্য ও কল্যাণ অর্থনীতি
৩৩০ গণতন্ত্রের ভাষা
৩৩৪ গণতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি
৩৩৯ আমাদের জাতিসত্তার বিপদ
৩৪২ বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা
৩৪৫ শেখ মুজিব প্রসঙ্গে
৩৪৯ একজন অখ্যাত মেজর-এর স্বাধীনতা ঘোষণা
৩৫২ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ
৩৫৫ কূটনীতির গোড়ার কথা
৩৫৯ বাংলার মুসলিম স্থাপত্য : মধ্যযুগ
৩৬৪ সাহিত্যের স্বরূপ ও তার বিচার বিশ্লেষণ
৩৭১ বাংলা গদ্য, রবীন্দ্রনাথ এবং অবাস্তব উচ্ছ্বাস
৩৭৪ বাংলাদেশে ইকবাল-দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা
৩৮০ কবিতায় সাম্প্রদায়িকতা
৩৮৪ কবিতা ও বোরখা
৩৯০ ভিন্ন প্রকৃতির শিল্পী সুলতান
৩৯৩ গানের ভুবনে আব্বাস উদ্দীন
৩৯৬ নব্য বাস্তববাদের প্রেরণা ছিল সত্যজিৎ রায়ের সাফল্যের সূত্র
৪০০ দীনেশচন্দ্র সেনরাও যেখানে আযানের সুরে অভিভূত
৪০৪ আমার স্মৃতিতে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন
৪০৭ শ্রী নেহেরুর ভারত আবিষ্কার
৪১১ নেহেরুর সেকুলারিজম-এর ধারণা নিয়েই বাংলাদেশে শুরু হয় ইসলাম বিরোধিতা
৪১৬ বাদামি সাহেব শ্রী নীরোদচন্দ্র চৌধুরী
৪২২ বাল্মীকির অপমৃত্যু
৪২৫ হিরোশিমা বার্ষিকী
৪২৮ গ্রিনহাউস ইফেক্ট ও বাংলাদেশ
৪৩৩ পৃথিবী কী মঙ্গলের অতীত অবস্থা?
৪৩৬ ধূমকেতুর ধাক্কা
৪৩৯ বৃহস্পতিতে ধূমকেতু ভেঙ্গে পড়া

৪৪২ আমার কাছে চার্লস ডারউইন
৪৫০ জিনোম নিয়ে ভাবনা
৪৫৫ আলবার্ট আইনস্টাইন ও বিগত শতাব্দীর দার্শনিক ভাবনা
৪৬৭ দাম্পত্য বনাম লাম্পট্য

সংযোজন

৪৭১ আমাদের রাজনীতি : পুরাকাল-সেকাল-একাল
৪৭৭ যুক্তি অভিসারী মানুষ সৃষ্টি
৪৮০ সন্ত্রাসবাদ
৪৮৫ আমাদের জাতিসত্তার স্বরূপ
৪৯০ ভারতের আসাম প্রদেশে মুসলমান

অগ্রন্থিত রচনা

৪৯৫ ভাসানীর ফারাক্কা মিছিল
৫০০ পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু-মুসলমান
৫০৫ যুদ্ধের আশঙ্কাকে অবহেলা ভুল করা হবে
৫০৯ বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে বাঙালি মুসলমান
৫১৩ সুব্রাহ্মমানিয়াম স্বামীর রণ হুংকার
৫১৭ বাংলাদেশে মৌলবাদ
৫২১ রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব
৫২৫ শেখ মুজিবুর রহমান : আমার দেখা নয়া চীন
৫২৯ বিএনপি'র নীতি নির্ধারণে গভীর বিভ্রাট
৫৩২ করোনা দুর্যোগ
৫৩৪ কাশ্মীরে যুদ্ধ সম্ভাবনা
৫৩৭ আমাদের সাংবাদিকতা
৫৪০ আমাদের সংস্কৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ

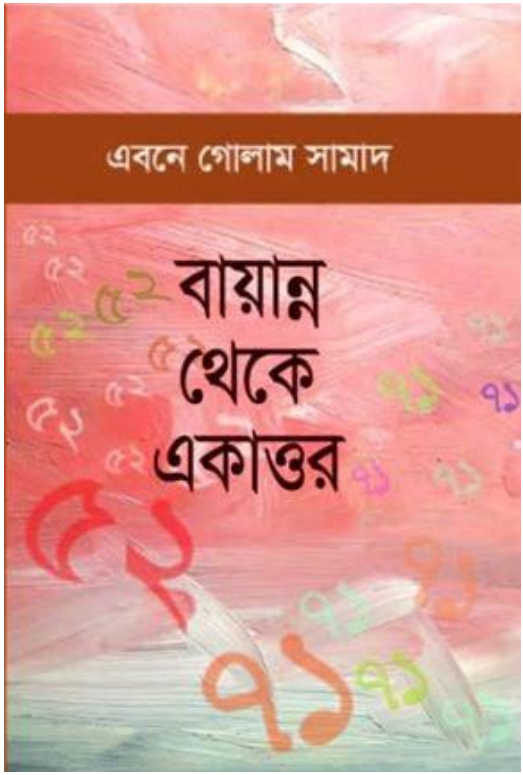

বায়ান্ন থেকে একাত্তর
প্রথম প্রকাশ: একুশে বইমেলা ২০১৭
প্রকাশক: পরিলেখ প্রকাশনী

উ ৎ স র্গ

আমার প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে
যারা ছাত্র-রাজনীতি করেনি কিন্তু দেশের কথা ভেবেছে

বাংলাদেশে বাংলা ভাষা

'বং' বলতে এক সময় বুঝাত বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের একটা ছোট অংশকে। পরে নামটা ব্যাপ্তি পেয়েছে। বাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষের মধ্যে থাকতে দেখা যায় মঙ্গলীয় মানব শাখাভুক্ত মানুষের বৈশিষ্ট্যের ছাপ। মঙ্গলীয় শাখাভুক্ত মানুষ এক সময় কথা বলতেন চীনা পরিবারভুক্ত ভাষায়। চীনা পরিবারভুক্ত ভাষায় 'য়ং' ধ্বনি সাধারণত যুক্ত থাকতে দেখা যায় নদীর নামের সঙ্গে। যেমন হোয়াংহ, ইয়াংসিকিয়াং, সাংপো। আমাদের তিস্তা নদীর পুরানা নাম হলো দিস্তাং। গংগা নদীর নামটাও সম্ভবত এসেছে চীনা পরিবারভুক্ত কোনো ভাষা থেকে। আমরা সাধারণ বাংলায় নদীকে বলি গাং। বংগ নামটা আর্য ভাষার নয়। এরকমই মনে করেন অনেক ভাষাতাত্ত্বিক। যাকে এখন বলা হয় পশ্চিমবংগ, এক সময় তাকে বলা হতো সুহ্ম। সুহ্মকে এক সময় রাঢ় দেশও বলা হতো; বংগ বলা হতো না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৩-১৮৭৩) তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রস্তাবনায় লিখেছেন:

অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে। এ থেকে বুঝা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও রাঢ় এবং বংগকে ঠিক একদেশ বলে মনে করা হতো না। যদিও ভাষার দিক থেকে গড়ে উঠেছিল ঐক্য। ঢাকাবাসীরা এক সময় মাইকেল মধুসূদন দত্তকে একটা অভ্যর্থনা প্রদান করেন। এই অভ্যর্থনার উত্তরে তিনি বলেন– ' আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে কোনো ভ্রমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছি, এ ভ্রমটি হওয়া ভারী অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ঘরে ও শয়ন করিবার ঘরে এক একখানি আর্শি রাখিয়া দিয়াছি, এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যেমনি বলবৎ হয়, অমনিতে আর্শিতে মুখ দেখি, আরও, আমি শুদ্ধ বাঙ্গালি নহে, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটি যশোহর।' মধুসূদনের কথা বাংলা ভাষা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বিশেষভাবেই আসে। কারণ তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জনক। তাঁর লেখা একটি সনেটে আমরা পাই বাংলা ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রথম পরিচয়। বাংলা ভাষার দুটি রূপ ছিল। সাধু ও চলিত। আমরা এখন আর সাধু বাংলা গদ্য লিখছি না। লিখছি চলতি বাংলা গদ্য। এই চলতি বাংলা ভাষার প্রথম ব্যবহার আমরা দেখতে পাই মধুসূদন দত্তের নাটকের সংলাপে। যদিও

এখন বলা হয় চলতি ভাষার ভিত্তি হলো প্রমথ চৌধুরীর গদ্য। অনেকের মতে আমরা আমাদের গদ্যের জন্য ইউরোপ থেকে আসা মিশনারিদের কাছে যথেষ্টভাবে ঋণী। বিদেশি মিশনারিদের কাছে এক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা ঋণী। ইউরোপীয়দের মধ্যে বাংলাদেশে প্রথম আসে পর্তুগীজরা। পর্তুগীজরা চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছায় ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে। পর্তুগীজ খ্রিষ্টান মিশনারিরা প্রথম বাংলা গদ্যে বই লেখেন খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে। এর আগে বাংলা গদ্যে ঠিক এভাবে ধর্ম প্রচারের জন্য কোনো বই লেখা হয়নি। সব দেশেই ধর্মকে ঘিরে হতে পেরেছে ভাষার প্রকর্ষ। বাংলা ভাষা এর ব্যতিক্রম নয়। ভূষণা বলতে বুঝাত সাবেক যশোহর ও ফরিদপুর জেলার একটি অঞ্চলকে। এই ভূষণার একজন হিন্দু সামন্তর পুত্রকে ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগীজ জলদস্যুরা ধরে নিয়ে যায়। পর্তুগীজ জলদস্যুদের কাছ থেকে তাকে ক্রয় করেন পর্তুগীজ খ্রিষ্টান পাদ্রি মনোয়েল দ্য রোজারিও (Manoel de Rozario)। এবং ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ধর্মে দিক্ষিত করেন। খ্রিষ্টান হওয়ার পর তার নাম হয় দোম আন্তোনিও দ্য রোজারিও (Dom Antonio de Rozario)। দোম আন্তোনিও রোজারিও প্রথম সাধু বাংলা গদ্যে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বই লেখেন। বইটির নাম 'ব্রাহ্মণ- রোমান- ক্যাথলিক সংবাদ' (Brahman- Roman- Catholic Sambad)। তখনও বাংলা অক্ষরে বাংলা বই ছাপানো শুরু হয়নি। বইটা প্রকাশিত হয় পর্তুগালের রাজধানী লিজবন শহর থেকে রোমক বর্ণমালায়। বইটির কপি সেখানে সংরক্ষিত আছে। এরপর সাধু বাংলা গদ্যে বই লেখেন পর্তুগীজ মিশনারির পাদ্রি মানুএল্-দ্য-আস্সুম্প্সাওঁ। তাঁর বইটির নাম 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ (Crepar Xaxtrer Orthbhed)। এ বইটি ছাপা হয় ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিজবন শহর থেকে রোমক বর্ণমালায় পুর্তগীজ উচ্চারণে। 'ব্রাহ্মণ- রোমান- ক্যাথলিক সংবাদ' ও 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' এই দুইটি বইকে ১৯৩০ এর দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পুনর্মুদ্রণ করা হয়। বই দুটিকে পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়নি। এর গদ্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন: '...এই দুই গ্রন্থ হইতেও প্রমাণিত হয় যে, সপ্তদশ শতকের শেষ ও অষ্টদশ শতকের প্রথমে এবং সম্ভবত ইহার পূর্বেই বাংলা গদ্য ভাষার যে একটি সরল প্রাঞ্জল রূপ ছিল তাহা সর্বাংশে সাহিত্যের উপযোগী। দেশীয় প্রবীণ সাহিত্যিকরা ইচ্ছা করিলে গদ্যে উৎকৃষ্ট রচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু যে কোনো কারণেই হউক তাঁহারা কবিতাই লেখা পছন্দ করিতেন।' এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পর্তুগীজ খ্রিষ্টান পাদ্রি মানুএল দ্য তাঁর বই লেখেন ঢাকার কাছে অবস্থিত ভাওয়ালে বসে। ঢাকা অঞ্চলেই তিনি শিখেছিলেন সুন্দর সাধু বাংলা গদ্য। মানুএল দ্য সংকলন করেন বাংলা-পর্তুগীজ অভিধান। পর্তুগীজ পাদ্রিদের বাংলা শেখার জন্য পুর্তগীজ ভাষায় রচনা করেন প্রথম বাংলা ব্যাকরণ। অথচ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ইতিহাস গ্রন্থে এখনো বলা হয় যে, বাংলা গদ্যের উদ্ভব হতে পেরেছে ইংরেজ আমলে কলকাতায় ইংরেজদের স্থাপিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে। এই ইতিহাস থেকে অনুমান করা চলে না যে পূর্ববংগে উন্নতমানের সাধু বাংলা গদ্য প্রচলিত

ছিল। বাংলা ভাষায় বাংলা অক্ষরে প্রথম বই ছাপান পশ্চিমবংগের শ্রীরামপুরে বৃটিশ প্রটেস্টান খ্রিষ্টান মিশনারিরা। আমরা এ বিষয়ে তাদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। বাংলা ভাষার ইতিহাসে উইলিয়াম কেরী, মার্স মান, ওয়ার্ড প্রমুখ শ্রীরামপুরে বৃটিশ প্রটেস্টান মিশনারিদের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এসব মিশনারিরা যে কেবল ধর্ম বিষয়ে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা নয়। বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়েও রচনা করেছিলেন একাধিক গ্রন্থ। তারা নিয়েছিলেন এদেশে শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ উদ্যোগ। যে কারণেও তারা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। অনেকে মনে করেন, ধর্ম হলো অজ্ঞতা, কুসংস্কারের ফল। কিন্তু ধর্মকে ঘিরে সব দেশেই গড়ে উঠেছে শিক্ষাকেন্দ্র। বিলাতের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন খ্রিষ্টান সাধু পুরুষরাই। প্রাচীন যুগে আমাদের দেশেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ধর্মকে নির্ভর করে। বাংলাদেশে মসজিদ কেবল প্রার্থনার স্থান হয়ে থাকেনি। হয়েছে বিদ্যা শিক্ষারও কেন্দ্র। বাংলা ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পালন করেছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এক সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল বাংলাভাষী অঞ্চলের স্কুল কলেজ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯০৮ সালে বিএ পরীক্ষা পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যকে আবশ্যিক পাঠ্য বিষয়রূপে নির্ধারণ করা হয়। এতে বাংলা ভাষা পেতে পারে একটা প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি। ১৯৩৫ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল পর্যায়ে ছাত্রদের সব বিষয়ে বাংলা ভাষায় পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করে। ১৯৪০ সাল থেকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে গ্রহণ করা আরম্ভ হয় প্রবেশিকা পরীক্ষা। এটা ছিল শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। যা বাংলা ভাষাটাকে করে তোলে শিক্ষার মাধ্যম। পাঞ্জাবি ভাষাভাষী অঞ্চল বৃটিশ নিয়ন্ত্রণে আসে ১৮৪৮ সালে। লাহোরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৮২ সালে। ১৯১৫ সাল থেকে পাঞ্জাবি ভাষা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো আরম্ভ হয়। কিন্তু পাঞ্জাবি ভাষা প্রধানত পড়েছেন শিখ ও হিন্দু পাঞ্জাবি ভাষাভাষীরা। পাঞ্জাবি ভাষাভাষী মুসলমান তাদের মাতৃভাষার বদলে বিশেষভাবে চর্চা করেছেন উর্দু। উর্দুর প্রতি তাদের গড়ে উঠেছিল বিশেষ ধরনের দুর্বলতা। বৃটিশ শাসনামলে সেনাবাহিনীতে বিশেষভাবে যোগ দিয়েছেন পাঞ্জাবি মুসলমানেরা। বৃটিশ সেনাবাহিনীর ভাষা হয়ে উঠেছে রোমক উর্দু। রোমক উর্দু বলতে বুঝিয়েছে রোমান অক্ষরে লেখা উর্দু ভাষাকে। উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করবার প্রস্তাবে তাই প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি পাঞ্জাবি মুসলমানদের মধ্যে। কিন্তু বাংলাভাষী মুসলমানদের মধ্যে উঠেছে প্রতিরোধ। এর একটি কারণ হলো, বাংলাভাষী মুসলমান সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়নি আর শেখেনি রোমান উর্দু। রোমান উর্দু শিখলে হয়তো রাষ্ট্রভাষা বাংলা আন্দোলন হতো না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালের জুলাই মাসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কোনো স্কুল কলেজ ছিল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক পর্যায়ে চলতি বাংলা গদ্যকে বিশেষ স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় করে চলতি বাংলা গদ্যের বিরোধিতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিখ্যাত অধ্যাপক মহিতলাল

মজুমদার ছিলন চলতি বাংলায় জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার বিরোধী। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব হয় না চলতি বাংলার প্রচলনকে স্থগিত করা। আমরা এখন লিখছি চলতি বাংলায়। কিন্তু এই চলতি বাংলা হয়ে থাকছে না আগের মতো ভাগিরথী তীরের মানুষের মুখের ভাষার মতো। এতে পড়ছে পূর্ববঙ্গের বাগধারার বিশেষ প্রভাব। এ প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত করে গিয়েছেন শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০)। তিনি তাঁর বিখ্যাত 'বাংলা ভাষার গতি' প্রবন্ধে বলেছেন– 'সেকালে যখন সাধু ভাষাই সাহিত্যের একমাত্র বাহন ছিল তখন সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকের রচনা পড়ে বুঝা যেতো না তাঁরা কোনো জেলার লোক। কলকাতার রমেশ চন্দ্র দত্ত, ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চাটগাঁয়ের নবীন চন্দ্র সেন, মহারাষ্ট্রের সখারাম গণেশ দেউস্কর একই ভাষায় লিখেছেন। তাঁদের রচনার গ্রাম্য বা প্রাদেশিক শব্দ না থাকায় ভাষার ভেদ হতো না। কিন্তু আজকাল চলিত ভাষায় যা লেখা হয় তা পড়লে প্রায় বুঝা যায় লেখক পূর্ববঙ্গীয় কিংবা পশ্চিমবঙ্গীয়। আপ্রাণ, সাথে, কিছুটা, কেমন জানি, (কেমন যেন), সুন্দর মতো ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গে চলে না। কিন্তু এসব শব্দ অশুদ্ধ নয়। অতএব বর্জনীয় বলা যায় না। পূর্ববঙ্গবাসী অতিরিক্ত 'গুলি' আর 'টা' প্রয়োগ করেন, অকারণে 'নাকি' লেখেন, অচেতন পদার্থেও মাঝে মাঝে রা যোগ করেন (আকাশ হতে জলেরা ঝরে পড়ছে), কর্মকারকে অনেক সময় অনর্থক কে বিভক্তি লাগান (বইগুলিকে গুছিয়ে রাখ)। তাঁরা নিজের উচ্চারণ অনুসারে 'দেওয়া নেওয়া সওয়া' স্থানে 'দেয়া নেয়া সোয়া' লেখেন, মোমবাতি অর্থে 'মোম' টেলিগ্রাম অর্থে 'টেলি' লেখেন। এসব প্রয়োগও নিষিদ্ধ করা যাবে না। বিলাত আর মার্কিন দেশের ভাষা ইংরেজি; কিন্তু অনেক নামজাদা লেখকের রচনায় ওয়েল্‌স স্কচ বা আইরিশ ভাষার ছাপ দেখা যায়, মার্কিন ইংরেজি অনেক সময় খাস ইংরেজের অবোধ্য ঠেকে। পূর্ববঙ্গীয় অনেক বৈশিষ্ট্য সাহিত্যিক বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে, তাতে আপত্তি করা চলবে না।'

আমরা আগে বলেছি যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বাংলা ভাষা পেতে পেরেছে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে। রাবীন্দ্রিক বাংলার প্রভাব বিশ্বভারতীর মাধ্যমে পূর্ববঙ্গের লেখকদের উপর সেভাবে পড়তে পারেনি। আমাদের গদ্যের ধারা রাবীন্দ্রিক নয়। আমরা রবীন্দ্রনাথের মতো গেলুম, খেলুম, পেলুম লিখি না। লিখি গেলাম, খেলাম, পেলাম। আমাদের ক্রিয়াপদের ব্যবহার রাবীন্দ্রিক নয়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেছেন, কিন্তু কোনোদিনই ভাবতে পারেননি বাংলা ভাষা কোনো স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রভাষা হতে পারবে। তিনি বিশ্বাস করতেন অখণ্ড ভারতে। যার ভাষা হবে হিন্দি। তিনি ১৯৩৯ সালে বিশ্বভারতীতে প্রচুর অর্থব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করেন হিন্দি ভবন। বিশেষ ব্যবস্থা করে যান হিন্দি শেখার। রবীন্দ্রনাথ মারা যান ১৯৪১ সালে। বিশ্বভারতী চেয়েছে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করতে। বিশ্বভারতী থেকে লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় প্রকাশ করা হয় শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা' নামক বই। যাতে তিনি বলেন,

উর্দু নয়, ভারতের রাষ্ট্রভাষা হতে হবে হিন্দি। হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে জোর প্রচারণা চানানো হয়েছিল বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে। কিন্তু এই কারণে রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর কোনো সমালোচনা আমরা এখন করি না। আমরা সমালোচনা করি কেবল উর্দু ভাষাপন্থিদের। আমরা কেন এটা করি তা আমার কাছে মোটেও স্পষ্ট নয়। মিরাট থেকে দিল্লি পর্যন্ত ভূ-ভাগের মানুষ সাধারণভাবে যে ভাষায় কথা বলেন তাকে বলা হয় হিন্দস্তানি। হিন্দস্তানি ভাষার সঙ্গে বেশি করে ফারসি ও ফারসি ভাষার মাধ্যমে প্রাপ্ত আরবি শব্দকে যোগ করলে তা হয়ে দাঁড়ায় উর্দু ভাষা। পক্ষান্তরে সংস্কৃত শব্দ বেশি যোগ করলে তা নেয় আধুনিক হিন্দি ভাষার রূপ। যাকে করবার চেষ্টা চলেছে ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। উর্দু ভাষায় যেখানে বলা হয় 'লেকিন' সেখানে আধুনিক হিন্দি ভাষায় বলা হয় 'পরন্তু'। উর্দু ভাষায় যেখানে লেখা হয় 'ইনতেজার' আধুনিক হিন্দি ভাষায় সেখানে লেখা হয় 'অপেক্সা'। হিন্দস্তানি ভাষায় কথা বলে মিরাট থেকে দিল্লি পর্যন্ত গ্রামে বাস করা মানুষেরা। কিন্তু উর্দু হয়ে আছে শহুরে মানুষের ভাষা। তার মধ্যে রয়েছে একটি নাগরিক মেজাজ। হিন্দি ভাষার মধ্যে যার আছে ঘাটতি। উর্দু আর হিন্দির মধ্যে আর এক পার্থক্য হলো লিপির। হিন্দি লেখা হয় নাগরি অক্ষরে। পক্ষান্তরে উর্দু লেখা হয় ফারসি-আরবি হরফে। হিন্দিভাষা বিদেশি ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করছে কম কিন্তু উর্দু ভাষা পাকিস্তানে প্রচুর ইংরেজি শব্দ গ্রহণ করছে। ভাষা হিসেবে উর্দু হয়ে উঠেছে অনেক মুক্তমনা আর গ্রহণপটু ভাষা। পাকিস্তানে উর্দু ভাষার ঘটছে দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি। ভারতে হিন্দি ভাষার ক্ষেত্রে যেটা হতে পারছে না। ভারতে ভাষা সমস্যার সমাধান হয়নি। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষাভাষীরা মানতে চাচ্ছেন না হিন্দি ভাষার দৌরাত্ম্য। তারা চাচ্ছেন ইংরেজি থাক ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষা। দক্ষিণ ভারতের মানুষ এখন অনেক বেশি করে ইংরেজি ভাষা শিখছেন। বলছেন অনেক ভালো ইংরেজি। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললীতার ইংরেজি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজি থেকে অনেক উন্নত। হিন্দি ভাষাকে মানতে চাচ্ছে না উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষ। হিন্দি এখনো হয়ে উঠতে পারেনি সারা ভারতের সাধারণ ভাষা। কিন্তু কদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে বলতে শোনা গেল, আমাদের হিন্দিভাষা শেখা উচিত। কারণ হিন্দি মসৃণ করে তুলবে বাংলা-ভারত সম্পর্ককে। কিন্তু ভারতের ভাষা সমস্যা মেটেনি। কেবল হিন্দি শিখে আমরা সারা ভারতের মানুষের সঙ্গে উন্নত সম্পর্ক তৈরির কথা ভাবতে পারি না; বরং ভালো করে ইংরেজি ভাষা শিখে আমরা ভারতের সঙ্গে মসৃণ সম্পর্ক সৃষ্টির প্রয়াসী হতে পারি। ইংরেজি ভাষা আমাদের ভালো করে শিখতে হবে, কারণ ইংরেজি ভাষা হয়ে উঠছে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষার মুখ্যভাষা। এক সময় ফরাসী ভাষা ছিল কূটনীতির মূল মাধ্যম। কিন্তু এখন ইংরেজি ভাষা অধিকার করে নিচ্ছে তার স্থান।

ফেব্রুয়ারি মাসকে ধরা হয় ভাষা আন্দোলনের মাস। যদিও ভাষা আন্দোলনের মিছিলের ওপর গুলি চলেছিল বাংলা ৮ ফাল্গুন ১৩৫৮ অব্দে। বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গার তুলনায় রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল খুব তীব্র। যদিও এখানে ভাষা আন্দোলনের মিছিলে চলেনি কোনো গুলি। হতে হয়নি কাউকে ভাষার জন্য শহীদ। রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই ইন্তিকাল করেছেন। ইন্তিকাল করেছেন স্বাভাবিকভাবেই। যতদূর জানি ভাষা সৈনিকদের মধ্যে বেঁচে আছেন গোলাম আরিফ টিপু। গোলাম আরিফ টিপু ব্যক্তিগত জীবনে একজন খ্যাতনামা আইন ব্যবসায়ী। তিনি এখন ওকালতি করছেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার মামলায়। তিনি দাবি করেছেন, ১৯৭১-এর যুদ্ধাপরাধী বলে অভিযুক্তদের ফাঁসি। গোলাম আরিফ টিপুকে ব্যক্তিগতভাবে যারা জানেন, তারা কেউ কেউ বলছেন, ১৯৭১-এর যুদ্ধের সময় গোলাম আরিফ টিপু গ্রহণ করেছিলেন চীনপন্থি কম্যুনিস্টদের পক্ষ। ১৯৭১-এর যুদ্ধকে তিনি বলেছিলেন 'দুই কুকুরের লড়াই'। কিন্তু এখন তার ভাবান্তর ঘটেছে। তিনি কেবল উকিল হিসেবেই নয়, ব্যক্তিগতভাবে অনেক বিশোদগার করছেন যুদ্ধাপরাধী বলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিপক্ষে। মনে হচ্ছে, বিচারের আগে শাস্তি নির্ধারিত হয়ে গেছে এসব ব্যক্তির। অনেক কিছুতেই খটকা লাগছে আমার মনে। আসলে আমাদের দেশের বামপন্থিরা এখন কী পেতে চাচ্ছেন, সেইটাই হয়ে উঠছে একটা বড় প্রশ্ন। আমার কাছে মনে হয় আমাদের জাতীয় সমস্যা কেবলই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার রাজনীতি হতে পারে না। বর্তমানে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুরক্ষিত করা।

বাংলাদেশ পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যার রাষ্ট্রভাষা হলো বাংলা। কেবল স্বাধীন বাংলাদেশেই ঘটতে পারে বাংলা ভাষার সুষ্ঠু বিকাশ। বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎনির্ভর করবে বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবার উপরেই।

আমার দেশ ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস

ভাষা আন্দোলন নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। কিন্তু অনেকেই অনেককিছু লিখেছেন, যার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি আছ বলে মনে হচ্ছে না। আমি এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাচ্ছি প্রধানত আমার ব্যক্তি-জ্ঞান থেকে। যখন ভাষা আন্দোলন হয় তখন আমি ছিলাম ছাত্র। এই আন্দোলনে অনেককিছুই ঘটেছিল আমার চোখের সম্মুখে। তাই এই প্রসঙ্গে করছি কিছু কথা আলোচনা। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার জন্য যা কিছুটা হলেও সহায়ক হতে পারে। রাজশাহীতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন খুব জোরালোভাবে হতে পেরেছিল। আন্দোলন জোরালোভাবে হতে পেরেছিল, রাজশাহী সরকারি কলেজকে নির্ভর করে। ১৯৪৮ সাল থেকেই রাজশাহীতে শুরু হয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। এই আন্দোলনে তিনজন অধ্যাপক ছাত্রদের উৎসাহিত করেছিলেন। এঁরা হলেন- ড. এনামুল হক, ড. শেখ গোলাম মাকসুদ হিলালী এবং মুহাম্মদ আবদুল হাই। ড. এনামুল হক বিশেষভাবে খ্যাত ছিলেন তাঁর আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বিখ্যাত গবেষণার জন্য। ড. শেখ গোলাম মাকসুদ হিলালী বিদ্বৎসমাজে খ্যাত ছিলেন Perso-Arabic Elements in Bengali নাম গবেষণামূলক সন্দর্ভের জন্য। মুহাম্মদ আবদুল হাই সাহেব ছিলেন একজন সফল শিক্ষক। তিনি রাজশাহী কলেজে অধ্যাপনা করার সময় অনুবাদ করেন মানবেন্দ্র নাথ রায় প্রণীত The Historical Role of Islam নামক গ্রন্থ। যার একটা প্রভাব পড়ে অনেক ছাত্রের ওপর। মুহাম্মদ আবদুল হাই পরবর্তীকালে বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের ওপর গবেষণামূলক বই লিখে পেতে পারেন বিশেষ খ্যাতি। আমি এ সময় ছিলাম রাজশাহী কলেজের ছাত্র। আজ যেমন বলা হচ্ছে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন হলো স্বাধীন বাংলাদেশ গড়বার সূচনা। সেটা আমার কাছে ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারছে না। কেননা, সে সময় এই তিনজন অধ্যাপকের কেউ-ই চাননি পৃথক স্বাধীন বাংলাদেশ গড়তে। তাঁরা কেবল চেয়েছিলেন সাবেক পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি। একটি উর্দু ও অপরটি হতে হবে বাংলা। এর বেশি কিছু তাদের কাম্য ছিল না। এঁরা রাজনীতির লোক ছিলেন না। এঁদের চর্চার বিষয়ে ছিল ভাষা-সংস্কৃতি। এঁরা বাংলা ভাষার পক্ষ নিয়েছিলেন বাংলাভাষী হিসেবে; রাজনীতিবিদ হিসেবে নয়। বাংলা ভাষা আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিস পালন করেছিল খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। তমদ্দুন মজলিস স্থাপিত হয়েছিল ইসলামপন্থি তরুণদের দ্বারা। এরা চেয়েছিলেন বাংলা ভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে; সাবেক পাকিস্তানকে ভেঙে দিতে নয়। এই সংগঠনের একজন বিশেষ উপদেষ্টা ছিলেন আবুল কাশেম। ইনি প্রথমে ছিলেন যতদূর

মনে পড়ে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক। কিন্তু পরে প্রতিষ্ঠা করেন বাঙলা কলেজ এবং হন এর প্রিন্সিপাল। আমি রাজশাহী কলেজ থেকে আইএসসি পাস করবার পর ঢাকায় যাই তেজগাঁও কৃষি প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করতে। লক্ষ্য ছিল একজন কৃষিবিদ হওয়া। এ সময় আবুল কাশেম সাহেবের সঙ্গে আমার কথোপকথনের কিছু সুযোগ ঘটে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমি এই ধারণাই পাই যে, তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করবার পক্ষে। তিনি কখনই বলেননি যে, তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য পৃথক স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার। আমি রাজনীতির লোক ছিলাম না। কিন্তু আমার সহোদরা রাজনীতি করতেন। তিনি মাঝে মাঝে লিখতেন তমদ্দুন মজলিসের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সৈনিকে'। আবুল কাশেম সাহেব এসেছিলেন আমার ভগ্নির বাড়িতে। সেখানে সুযোগ হয় তাঁর সঙ্গে কথা বলবার। বাংলা ভাষা আন্দোলনে যারা অংশ নিয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে কথা বলে আমি যা বুঝেছিলাম, তা হলো, উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করলে উর্দু যাদের মাতৃভাষা কেবল তারাই পেতে পারবেন বড় বড় চাকরি। বাংলাভাষী তরুণরা কেরানির চাকরি পেলেও উর্দুভাষার মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে পেতে পারবেন না বড় বড় সরকারি পদে চাকরি। ভাষা আন্দোলনের একটা অর্থনৈতিক দিক ছিল। তা ছিল চাকরি সংক্রান্ত। আর এই চাকরি হলো পাকিস্তানের সরকারি চাকরি। বাংলা ভাষা আন্দোলন হয়েছিল সাবেক পাকিস্তানের রাষ্ট্রীক কাঠামোর মধ্যে। উর্দুকে করার কথা হয়েছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র সরকারি ভাষা। এটা বাঞ্ছিত ছিল না বাংলাভাষী মুসলমান তরুণ সমাজের কাছে। তরুণ সমাজ তাই উদ্যোগ নেন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করবার। এ হলো বাংলা ভাষা আন্দোলনের অর্থনৈতিক ভাষ্য। সংস্কৃতিক দিক থেকে এর একটা কারণ হলো, যাকে নৃতত্ত্বের ভাষায় বলে সংস্কৃতির সংঘাত। উর্দুভাষীরা তাদের নিজেদের মনে করতেন বাংলাভাষীদের চাইতে উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী। তাদের এই অহংকার তাদের ওপর সাধারণভাবে বাংলাভাষী তরুণদের বিরূপ করে তুলেছিল। তারা চাননি উর্দুভাষীদের সাংস্কৃতিক উদ্ধতকে স্বীকার করে নিতে। বড় চাকরি পাওয়া সম্ভব হবে না এবং উর্দুভাষীরা সংস্কৃতির দিক থেকে আমাদের করবেন নিয়ন্ত্রণ, এটা চাননি বলেই এ দেশের তখনকার শিক্ষিত তরুণ সমাজ ব্রতী হয়েছিলেন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে। আমার মতে এই হলো রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বিশেষ ভাষ্য। এই আন্দোলনের লক্ষ্য এখন যেমন বলা হচ্ছে, ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ গড়া। সে সময় সেটা আদৌ ছিল না বলেই আমার ধারণা। বাংলাদেশের তরুণরা ইংরেজ আমলে লেখাপড়া করতেন প্রধানত সরকারি চাকরির পাওয়ার জন্য। সরকার ছিল সবচেয়ে বড় চাকরি দাতা। উচ্চ সরকারি চাকরি পাবেন না বলে বাংলাভাষী শিক্ষিত তরুণরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং যুক্ত হয়েছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে।

১৯৭৩ সালে একটি বই পড়েছিলাম। বইটির নাম 'Dateline Mujibnagar'। বইটি লিখেছেন Arun Bhatta Charja। বইটি প্রকাশিত হয়েছে Vikas Publishing House,

Newdilhi থেকে ১৯৭৩ সালে। এতে এক জায়গায় (পৃষ্ঠা ১৯৫) বলা হয়েছে যে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন ভারত সরকার কর্তৃক পাকিস্তানে নিযুক্ত হাইকমিশনার সি সি দেশাই। পাকিস্তানে নিযুক্ত হাইকমিশনার তখন থাকতেন করাচিতে। কারণ করাচি ছিল পাকিস্তানের রাজধানী। ভারতের হাইকমিশনার সি সি দেশাই গোপনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে দেখা করেন এবং বলেন পূর্ব পাকিস্তান যদি স্বাধীন হতে চায়, তবে সেই প্রচেষ্টায় ভারত সাহায্য সহযোগিতা প্রদানে প্রস্তুত আছে। ভাসানীর সঙ্গে সি সি দেশাইয়ের দেখা হয়েছিল টাঙ্গাইলে আর পি সাহা কর্তৃক মেয়েদের স্কুলের একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। এই তথ্য কতদূর সত্য তা আমি জানি না। আমি এরকম কথা আর কোনো সূত্র থেকে পেতে পারিনি। সম্প্রতি খ্যাতনামা ভাষা সৈনিক আবদুল মতিন বলেছেন যে, ভাষা আন্দোলনে ভাসানীর ভূমিকা নিয়ে কোনো মূল্যায়ন হচ্ছে না। আমি মনে করি এ বিষয়ে আবদুল মতিন সাহেবের কিছু নিজে থেকেই মূল্যায়ন করা উচিত। আমি ভাসানী সাহেবের রাজনীতি কখনই বুঝে উঠতে পারিনি। আমার কাছে মনে হয়েছে তিনি একজন 'নামধর্মী রাজনীতিবিদ'। যিনি চেয়েছেন সংঘাত সৃষ্টি করে রাজনীতি করতে; ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশ গড়তে নয়। আমার মনে পড়ে ভাসানী সাহেব ১৯৭০ সালে বলেছিলেন- ভোট করে কিছু হবে না। ভোটের আগে ভাত চাই। কিন্তু ভোট হওয়ার পরে সেই তিনিই আবার বললেন, শেখ মুজিব তুমি যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবি পরিত্যাগ কর, তবে বাংলাদেশের মানুষ পিটিয়ে তোমার পিঠের চামড়া তুলে নিতে চাইবে। আমি খুব বিস্মিত হয়েছিলাম ১৯৭১ সালে ভাসানী সাহেবকে ভারতে হিজরত করতে দেখে। ভারতে তাঁকে রাখা হয়েছিল গৃহবন্দি করে। তিনি ভারতে গিয়ে কোনো রাজনীতিই করতে পারেননি। ১৯৭৬ সালে মে মাসে তিনি এসেছিলেন রাজশাহীতে; তাঁর বিখ্যাত ফারাক্কার মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। এসময় তিনি এক ঘরোয়া বৈঠকে বলেছিলেন- তড়িঘড়ি করে পাকিস্তান ভেঙে দেয়া ঠিক হয়নি। ভাসানীর মূল্যায়ন তাই আমার কাছে মনে হয় খুবই জটিল। এখন অনেক বামচিন্তক ব্যক্তি বলছেন, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নিয়ে নাকি মূল নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন সে সময়ের কম্যুনিস্ট পার্টি। কিন্তু আমি এর সঙ্গে আদৌ একমত নই। কারণ, সে সময়ের দলিল ও পত্র পত্রিকা ঘেঁটে আমি আবগত হতে পেরেছি যে, পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি ছিল ছাত্রদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করবার বিরোধী। কারণ, তারা মনে করেছিলেন এটা করা হবে হটকারিতা। এতে বাড়বে সরকারের দমন নীতি। যা প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা ছাত্রদের নেই। কিন্তু পুলিশ গুলি চালালে সারা দেশজুড়ে সর্বসাধারণ এসে দাঁড়ায় ছাত্রদের পক্ষে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন হয়ে দাঁড়ায় একটা বড় রকমের গণআন্দোলন। এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সে সময়ের পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সাজ্জাদ জহির। তিনি ছিলেন উর্দুভাষী। ভারত থেকে তিনি যান করাচী। সাজ্জাদ জহির অভিমত দেন যে, একমাত্র উর্দুকে করা উচিত হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কেবল জিন্নাহ

সাহেব নন, পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকও চেয়েছিলেন উর্দুকে একমাত্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে। সাজ্জাদ জহির ছিলেন এই উপমহাদেশের কম্যুনিস্টদের একজন খুবই বড় মাপের নেতা। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগেই তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা কম্যুনিস্ট নেতা। যারা ভাষা আন্দোলনে বলতে চাচ্ছেন কম্যুনিস্টরা নেতৃত্ব দিয়েছিল, তার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি আমি তাই খুঁজে পাচ্ছি না। যারা এই বিষয়ে জানতে চান, তারা মুহাম্মদ তোয়াহা ও ভাষা সৈনিক গাজীউল হকের দেয়া বিশেষ সাক্ষাৎকার দুটি পড়ে দেখতে পারেন। সাক্ষাৎকার দুটি প্রকাশিত হয়েছিল মাহবুব উল্লাহ সম্পাদিত ২০০৮ সালে প্রকাশিত 'মহান একুশে সুবর্ণজয়ন্তী গ্রন্থ'-তে। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল 'অ্যাডর্ন পাবলিকেসন্স' ঢাকা থেকে। বাংলা ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে এরকম তথ্যবহুল গ্রন্থ আর আছে বলে আমার জানা নেই।

ভাষা আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল ১৯৫২ সালে। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে একটি নির্বাচিত সরকার ছিল। যার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নুরুল আমীন। কিন্তু এখন অনেকের লেখা পড়ে মনে হয়, দেশে চলেছিল সামরিক জান্তার শাসন। যেটা আদৌ সত্য নয়। পাকিস্তানে প্রধান সেনাপতি আইউব খান ক্ষমতা দখল করেছিলেন ১৯৫৮ সালের ২৮ অক্টোবর। কিন্তু আইউব খান রাষ্ট্রভাষা নিয়ে কোনো বিতর্ক তুলতে চাননি। তিনি বহাল রাখেন রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দু ও বাংলাকে। আইউব খানের অন্যতম পরামর্শদাতা ছিলেন বিখ্যাত কবি ও দার্শনিক ইকবালের পুত্র জাভেদ ইকবাল। তিনি তার The Ideology of Pakistan and its Implementation (1959) বইতে বলেছেন যে, যদিও একটি রাষ্ট্রের একমাত্র রাষ্ট্রভাষাই হওয়া ভালো, কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাস্তবতাকে বিবেচনা করে দু'টি রাষ্ট্রভাষা মেনে নিতে সম্মত হতে হবে। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তানের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে করতে হবে বাংলায় এমএ পর্যন্ত পড়বার ব্যবস্থা (পৃষ্ঠা ৬৯-৭৯)। অর্থাৎ সাবেক পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি মীমাংসিত হতে পেরেছিল। সাবেক পাকিস্তান ভেঙে যাবার কারণ ঘটেছিল পরে; সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলন সাবেক পাকিস্তান ভেঙে যাবার কারণ ছিল না। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এইটুকুই বলতে পারি আমি। পত্রিকায় দেখলাম (দৈনিক বর্তমান; ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪) রণেশ মৈত্র বলেছেন, ভাষা সংগ্রামীদের তালিকা-গেজেট ও ভাতার ব্যবস্থা চাই। কিন্তু ভাষা আন্দোলন যারা করেছিলেন, তারাতো এমন দাবি তুলছেন বলে আমি জানি না। ভাষা আন্দোলন যারা করেছিলেন, তারা সেটা করেছিলেন বাংলাকে সাবেক পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে; কোনো ভাতা পাবার লক্ষ্য নিয়ে নয়।

ভিন্ন প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন

দিল্লি ও তার সন্নিকটস্থ অঞ্চলে চলতো ব্রজভাষা। ব্রজভাষার সঙ্গে প্রচুর ফারসি ও ফারসির মাধ্যমে আসা শব্দ মিলে তৈরি হয়েছে উর্দুভাষা। এই রকমই মনে করেন অনেক ভাষাবিদ। তবে এ বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। শব্দগত অর্থে উর্দু মানে হলো সেনা ছাউনি। অর্থাৎ সেনা ছাউনিতে সৈন্যদের মুখে ব্রজভাষা থেকে উদ্ভব হয়েছিল এই ভাষার। উর্দু শব্দটা হলো তুর্কি ভাষার। তবে উর্দুতে তুর্কি শব্দ বিশেষ নেই। বাইরে থেকে আসা মুসলিম তুর্কিরা ঘরে তুর্কি ভাষা বললেও তাদের রাজকার্য চলেছে মূলত ফারসি ভাষার মাধ্যমে। তাই উর্দুতে আছে ফারসি শব্দের প্রাচুর্য, তুর্কি শব্দ নেই বললেই হয়। যদিও ভাষাটার নাম হচ্ছে তুর্কি। আর তুর্কি ভাষায় শব্দটার নাম হচ্ছে সেনা ছাউনি। উর্দুকে হিন্দুস্তানিও বলা হয়। হিন্দু শব্দটা ফারসি ভাষার। আদিতে বুঝিয়েছে সিন্ধু নদের তীরবর্তী মানুষকে। যাকে বলা হয় আধুনিক হিন্দিভাষা, তার উদ্ভব খুব বেশিদিন আগে হয়নি। এর উদ্ভব হয়েছে উর্দুর প্রতিক্রিয়া হিসেবে এবং হিন্দুত্ব রক্ষার ইচ্ছায়। অনেক সময় উর্দুর সাধারণ কথিত রূপকেও হিন্দুস্তানি বলে উল্লেখ করা হয়। উর্দু লেখা হয় ফারসি আরবি অক্ষরে। কিন্তু হিন্দি লেখা হয় নাগরি অক্ষরে। হিন্দ-উর্দুর মধ্যে এটা আর একটি পার্থক্য। বৃটিশ ভারতে আদমশুমারিতে দেখা যায় যে, সে সময়ে ভারতে সবচেয়ে বেশি লোক কথা বলতো হিন্দুস্তানি ভাষায়। তারপরেই জনসংখ্যার দিক থেকে ছিল বাংলা ভাষার স্থান। হিন্দি ভাষার তুলনায় বাংলা গদ্য ছিল অনেক উন্নত। ১৯৩০ সালে মীর মশাররফ হোসেনের লেখা 'বিষাদসিন্ধু' বই হিন্দিতে অনূদিত হয়। বইটি হিন্দিতে অনুবাদ করেন কবিন্দ্র বেনীপ্রসাদ। মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭ - ১৯১১) যথেষ্ট উন্নতমানের গদ্য লিখেছেন। বাংলা সাহিত্য এসময় ছিল অগ্রসর। তাই বাংলা থেকে হিন্দিতে অথবা হিন্দুস্তানিতে অনূদিত হয়েছে বহুগ্রন্থ। কিন্তু যখন প্রশ্ন উঠেছে ভাবি স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা অথবা সাধারণ ভাষা কী হবে, তখন হিন্দুরা সমর্থন করেছেন হিন্দিকে। আর মুসলমানরা সমর্থন করেছেন উর্দুকে। এক্ষেত্রে হিন্দি বলতে বুঝিয়েছে আধুনিক সংস্কৃতবহুল হিন্দিভাষাকে। হিন্দি উর্দুর মধ্যে কোনো ব্যাকরণগত পার্থক্য নেই। পার্থক্য হলো শব্দসম্ভারে এবং লিপির ক্ষেত্রে। কেউই ব্রিটিশ শাসনামলে বলেননি বাংলা ভাষাকে করতে হবে ভাবি স্বাধীন ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু সাবেক পাকিস্তানে উঠেছিল এই দাবি। এ প্রসঙ্গে আমরা পরে আরও আলোচনায় আসছি। বৃটিশ আমলে ভারতে উর্দুকে সব মুসলমান সমর্থন করেছেন রাষ্ট্র বা সাধারণ ভাষা করবার জন্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় ১৯৩৮ সালে এ কে ফজলুল

হক All India Muslim Educational Conference -এর সভাপতির ভাষণে বলেন, স্বাধীন ভারতের সাধারণ ভাষা (Lingua Franca) হতে হবে উর্দু। ফজলুল হক সাহেবের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। কিন্তু তিনি সমর্থন করেন উর্দুর দাবিকে। অন্যদিকে ১৯৪০ সালে নাগপুরে হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধী বলেন, উর্দু ভাষার বিকাশ হয়েছে মুসলিম নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায়। ভাবি স্বাধীন ভারতে উর্দুর আরও বিকাশ করতে হলে তার দায়দায়িত্ব হলো মুসলমানদের, অন্যদের নয়। মহাত্মা গান্ধীর মাতৃভাষা হিন্দি ছিল না, ছিল গুজরাতী। তিনি তার বিখ্যাত সর্বদ্বয় নামক বই লিখেছেন গুজরাতী ভাষায়। অর্থাৎ বৃটিশ আমলে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল হিন্দি-উর্দুর বিতর্ক। বাংলার দাবি সেখানে ছিল অনুপস্থিত। ১৯৪৮ সালে জিন্নাহ সাহেব যখন বলেন যে, উর্দুকেই করতে হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, তখন তিনি তা বলেছিলেন পুরাতন ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে। এ সময় হিন্দিকে ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বিষয়টি ছিল সাবেক ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে উদ্ভূত রাজনীতির জের। এটা নতুন কিছু ছিল না। জিন্নাহর মাতৃভাষা ছিল মহাত্মা গান্ধীর মতোই গুজরাতী। তিনি তার প্রথম জীবনে রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনা করেন মাতৃভাষা গুজরাতীতে। তিনি গুজরাতী বলতে ও লিখতে পারতেন। তিনি উর্দুভাষায় মোটেও পারদর্শী ছিলেন না। উর্দু বলতেন ভাঙা ভাঙা ভাবে। ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকায় উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করবার সমর্থনে যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তা তিনি দিয়েছিলেন বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায়; উর্দু ভাষায় নয়।

আমাদের একদল কথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী জিন্নাহ সাহেবের সমালোচনা করে চলেছেন উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করবার দাবির জন্য। কিন্তু তিনি যে কেবল উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করবার দাবি তোলেন, তা কিন্তু নয়। ১৯৫১ সালের ২৪ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'পাকিস্তান জিন্নাহ আওয়ামী লীগ'। ১৯৫২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সিন্ধুর হায়দ্রাবাদ শহরে সোহরাওয়ার্দী সাহেব বলেন, যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই আদর্শ অনুসারে একমাত্র উর্দুই হওয়া উচিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এটা তিনি বলেছিলেন ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির দুদিন পরে। অর্থাৎ ঢাকায় ছাত্র-মিছিলে গুলি চলার পরে। আমাদের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা জানেন না যে, পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ জহিরও বলেছিলেন যে, উর্দুই হওয়া উচিত পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। অর্থাৎ দক্ষিণপন্থি ও বামপন্থি দৃষ্টিকোণ ভাষার প্রশ্নে হয়ে উঠেছিল একই। মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করেন, শ্রমিক শ্রেণিরা করবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই উপমহাদেশে শ্রমিকরা হিন্দু-উর্দু যতটা বুঝতেন, বাংলা তা বুঝতেন না। বাংলার মানুষ মূলত ছিলেন কৃষিজীবী। মার্কস যে অর্থে শ্রমজীবী কথাটা তার বিখ্যাত কম্যুনিস্ট মেনুফেস্টুতে বলেছেন, বাংলার কৃষকরা সেই সংজ্ঞায় পড়েন না। তাই

তাদের ভাষাকে নির্ভর করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অসম্ভব। সারা উপমহাদেশে কম্যুনিস্টরা হিন্দি ভাষায় আওয়াজ তুলেছিলেন,

ইয়ে আজাদী ঝুট্টা হ্যায়
লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়।

অর্থাৎ বিদেশি বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটেছে, কিন্তু তা বলে প্রকৃত স্বাধীনতা আসেনি। লক্ষ লক্ষ লোক এখনও অনাহারে ধুঁকছে। করতে হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। বদলাতে হবে সমাজজীবনের আর্থিক কাঠামো। এ ছিল তখন বামপন্থিদের বিরাট অংশের চিন্তা চেতনা। রাষ্ট্রভাষার দাবি তাই তাদের কাছে ছিল কেবল অবান্তরই নয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে মানুষের চেতনাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়া। এটা একটা বুর্জোয়া চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। এই উপমহাদেশে প্রকৃত শ্রমজীবীদের অধিকাংশের ভাষা হলো উর্দু বা হিন্দুস্তানি। সেটাকেই মানতে হবে বিপ্লবের ভাষা হিসেবে। তার মাধ্যমেই প্রচার করতে হবে বিপ্লবের বাণী। পূর্ব পাকিস্তানের কিছু বামপন্থি অবশ্য ছিলেন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করবার পক্ষে। কিন্তু সেইটাই বামরাজনীতির মূলধারা ছিল না। তারা ভাবছিলেন গায়ের জোরে দখল করতে হবে রাষ্ট্র-ক্ষমতা। রাষ্ট্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে গঠন করতে হবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি। তারা ভুগছিলেন এক রোমান্টিক বিপ্লববাদে। আমাদের অর্থনীতি বৈষয়িক ও কৃতকৌশলের দিক থেকে ছিল খুবই অনগ্রসর। কার্ল মার্কস বলেছেন, উৎপাদনি শক্তি বাড়াতে হবে। উৎপাদনি শক্তি বাড়ে নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে। কিন্তু তার এই শিক্ষাকে ভুলে যেয়ে এদেশের বামপন্থিরা চাচ্ছিলেন বিপ্লব করতে; যেটা সম্ভব ছিল না। কেননা, উৎপাদনি শক্তির বিকাশের ওপর নির্ভর করে উৎপাদনি সম্পর্ক। উৎপাদনি শক্তির বিকাশ ছাড়া উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন সম্ভব নয়। কিন্তু ইলামিত্র ১৯৫০ সালের ৫ জানুয়ারি চাপাই নবাবগঞ্জের নাচোল থানায় ঘটান সাঁওতাল বিদ্রোহ। এই সালেরই ২৪ এপ্রিল কম্যুনিস্টরা রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের খাপড়া ওয়ার্ডে কয়েদিদের সাথে হাত মিলিয়ে করতে চান উত্থান। তখন পাকিস্তান সবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ দেশে মুসলিম জনসমষ্টি তখন ভাবছিলেন পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে। তাদের কাছে এ ধরনের অভ্যুত্থান মোটেও গ্রহণযোগ্য ছিল না। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন অনেকের কাছে মনে হয়েছিল একটা পাকিস্তান বিরোধী ষড়যন্ত্র হিসেবে। তারা তাই করেছিলেন এর বিরোধিতা। ষড়যন্ত্র যে কিছু হয়েছিল না, তা বলা যাবে না। Arun Bhattacharja একটি বই লিখেছেন Dateline mujibnagar নামে (Bikas Publishing house. New Dilhi 1973)। এই বইয়ের ৯৫ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন যে, ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় গুলি চলার পর পাকিস্তানে নিযুক্ত সে সময়ের ভারতীয় হাইকমিশনার সি সি দেশাই নাকি গোপনে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা করেন। এই সাক্ষাৎকারটি ঘটেছিল টাঙ্গাইলে আর পি সাহা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের স্কুলের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠাকে। সি সি দেশাই নাকি ভাসানীকে বলেছিলেন,

পূর্ব পাকিস্তান যদি স্বাধীন হতে চায়, তবে ভারত তাতে মদদ দেবে। অরুণ বাবুর কথা কতটা নির্ভরযোগ্য আমি তা জানি না। তবে এরকম ষড়যন্ত্রের কথা তখন হয়তো পাকিস্তান সরকার কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন।

ভাষা আন্দোলন হয়েছিল সাবেক পাকিস্তানের রাষ্ট্রিক কাঠামোর মধ্যে। সুলতানি আমলে বাংলার সরকারি ভাষা বাংলা ছিল না। রাজকার্য চলতো ফারসি ভাষার মাধ্যমে। বাদশাহী আমলেও ফারসি ভাষার মাধ্যমে চলেছে সরকারি কাজকর্ম। বৃটিশ শাসনামলে ইংরেজি ছিল রাজকর্মের ভাষা। বাংলা কোনোদিনই রাজকর্মের ভাষা ছিল না। এমনকি বৃটিশ শসনামলেও ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত ফারসি ছিল আদালতের ভাষা। মুসলমান বাড়ির ছেলেরা লেখাপড়া শিখতেন প্রধানত ফারসি ভাষার মাধ্যমে। আর ফারসি জানার জন্য পেতে পারতেন সরকারি চাকরি। কিন্তু ইংরেজি চালু হওয়ার ফলে তারা বিবেচিত হতে থাকলেন অশিক্ষিত হিসেবে। সরকারি চাকরিতে থাকলো না তাদের আর পূর্বেকার অধিকার। ইংরেজি শিক্ষার মূল কেন্দ্র ছিল কলকাতা শহর। কলকাতা শহরে বরাবরই মুসলমানরা বিশেষ বাস করতেন না। গোটা পশ্চিম বাংলাতেই মুসলমানরা ছিলেন সংখ্যায় কম। ইংরেজি শিক্ষার সুযোগও তাই ছিল তাদের জন্য কম। বৃটিশ শাসনে তাই তারা হয়ে পড়েন সরকারি জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। তাদের জীবনে নেমে আসে বিশেষ সংকট। ইংরেজ আমলে মুসলমানরা হয়ে পড়েন ইংরেজ ও হিন্দুশাসিত। বাঙালি হিন্দু ইংরেজি শিখে সারা উত্তর ভারতে পেতে থাকেন ইংরেজদের পরেই সরকারি চাকরি। তারা হয়ে উঠেন একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণি। তাদের হাতে গড়ে উঠে নতুন বাংলা গদ্য রস-সাহিত্য। এ থেকে এই ধারণার উদ্ভব হয় যে, বাংলা হলো বাঙালি হিন্দুর ভাষা; মুসলমানের ভাষা নয়। যে ধারণাটা আগে ছিল না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চা করলে দেখা যায়, যে বাংলাটা আমরা বুঝি এবং যাকে বাংলা ভাষা বলতে কারও আপত্তি হয় না, সেই বাংলা ভাষায় লেখা এ পর্যন্ত যত পুরানো বই আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে শাহ মুহম্মদ সগীরের (১৩৮৯-১৪০৯) লেখা *ইউসুফ জুলেখা* হলো সর্ব প্রাচীন। সুলতানি আমলের আগের কোনো বাংলা বই এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। সুলতানি আমলে মুসলিম পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষভাবে শুরু হতে পেরেছিল বাংলা ভাষা সাহিত্যের চর্চা। এর একটা কারণ ছিল ফারসি ভাষার সংস্পর্শে এসে চিন্তা চেতনার বিশেষ জাগরণ। ফারসি তখন ছিল বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা। বাংলাভাষী মুসলমসানের ধর্ম চেতনায় আরবির থেকে ফারসি ভাষা রেখেছে অনেক বড় অবদান। নামাজ, বেহেস্ত, দোযখ, পয়গম্বর এসব শব্দ আরবি ভাষার নয়। খোদা শব্দটা আরবি ভাষার হলেও, তা বাংলা ভাষায় এসেছে ফারসি ভাষারই মাধ্যমে। প্রায় ৭০০ বছর ধরে ফারসি ছিল বাংলার সরকারি ভাষা। আর ফারসি সংস্কৃতির হাত ধরে বাংলা সাহিত্যের ঘটেছে অগ্রগতি। ফারসি গদ্যের ধারায় উদ্ভব হয়েছে বাংলা গদ্য। যাতে অনেক জায়গায় রচিত হয়েছে দলিল-দস্তাবেজ।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে স্থাপিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছিল উচ্চবিদ্যালয়সমূহের সর্বোচ্চ পরীক্ষা গ্রহণ এবং কলেজসমূহের পরীক্ষা গ্রহণ। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো পাঠদানের ব্যবস্থা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয় যথেষ্ট পরে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ড. ই এম স্যাডলারকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়। স্যাডলার ছিলেন বিলাতের লিড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। তার সভাপতিত্বে গঠিত হয় স্যাডলার কমিশন (১৯১৭-১৯১৯)। এই কমিশনের কাজ হিসেবে বলা হয়, শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার কল্পে সুপারিশ প্রণয়ন। স্যাডলর কমিশন অনেক সুপারিশ প্রণয়ন করেন। স্কুলের শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা বলেন, ইংরেজিতে শিক্ষাপ্রদান না করে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রদান ও পরীক্ষা গ্রহণ করতে। তারা বলেন যে, একমাত্র ইংরেজি ও গণিত ছাড়া আর সব বিষয়ে স্কুলের ছাত্রদের পঠন পাঠন করতে হবে মাতৃভাষায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করে বাংলা প্রদেশে স্কুল পর্যায়ে বাংলা ভাষায় পাঠ দান আরম্ভ করেন। অবশ্য এই পাঠদান ব্যবস্থা করতে বেশ কয়েক বছর সময় লেগেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রথম বাংলায় প্রবেশিকা পরীক্ষা (Entrance) গ্রহণ করা হয় ১৯৪০ সালে। অর্থাৎ ইংরেজ আমলে স্কুল পর্যায়ে বাংলা হয়ে উঠে বাংলা প্রদেশে শিক্ষার মাধ্যম।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি পাঞ্জাব দখল করে ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে। পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো শুরু হয় পাঞ্জাবি ভাষা-সাহিত্য। পাঞ্জাবের সর্বত্র এই পাঞ্জাবি ভাষা চলতো না। পাঞ্জাবি ভাষার একটা উপভাষা হলো *লহন্দা* বা *হিন্দকী*। এই উপভাষায় বিশেষভাবে কথা বলতেন পশ্চিম পাঞ্জাবের লোক। এরা ছিলেন মুসলমান। এই ভাষার কোনো লিখিত সাহিত্য ছিল না। পাঞ্জাবি বলতে যে ভাষাটাকে বুঝায়, তা চলত প্রধানত লাহোর ও পূর্ব পাঞ্জাবে। পূর্ব পাঞ্জাবে বাস করতেন শিখরা। শিখরাই করেন বিশেষভাবে পাঞ্জাবি ভাষার চর্চা। তাদের হাতে গড়ে উঠেছে বর্তমান পাঞ্জাবি সাহিত্য। পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর ও পশ্চিম পাঞ্জাব পড়েছে পাকিস্তানে। কিন্তু পূর্ব পাঞ্জাব পড়ে ভারতে। পূর্ব পাঞ্জাবের আবার সব অংশে যে পাঞ্জাবি বলা হতো, তা নয়। দক্ষিণ অংশে মানুষ বলতো হিন্দি। পাঞ্জাবি ভাষা লেখা হয় গুরুমুখী অক্ষরে। কিন্তু পাঞ্জাবি হিন্দুরা হিন্দি লিখতের নাগরী অক্ষরে। পাঞ্জাবি হিন্দুরা এখন পৃথক হয়ে একটা ভিন্ন প্রদেশ গঠন করেছেন। যার নাম হয়েছে হরিয়ানা। এর সরকারি ভাষা হলো হিন্দি। পাঞ্জাবি ভাষা বলেন এবং চর্চা করেন শিখরা। তারা গঠন করেছেন পাঞ্জাবি ভাষী শিখ-সুবা। পশ্চিম পাঞ্জাব যা পড়েছে পাকিস্তানে, সেখানে পাঞ্জাবি ভাষার তেমন চর্চা নেই। পাঞ্জাবি হিন্দুরা যেমন করতেন হিন্দির চর্চা, পাঞ্জাবি মুসলমানরা করতেন তেমনি আবার উর্দুর চর্চা। উর্দু ছিল তাদের মানসিক প্রকর্ষের ভাষা (Culture Language)। পাঞ্জাবের কবি ইকবাল কবিতা

লিখেছেন ফারসি এবং উর্দুতে। যে অংশ নিয়ে গঠিত হয় সাবেক পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ, সেখানে উর্দু হয়ে উঠেছিল মানসিক প্রকর্ষের ভাষা। উর্দুর প্রভার পড়ার আর একটি বিশেষ কারণও ছিল। বৃটিশ সেনাবাহিনীতে চলতো রোমান উর্দু। রোমক উর্দু বলতে বুঝাতো, রোমক অক্ষরে (ইংরেজি অক্ষরে। প্রকাশ থাকে যে, ইংরেজি ভাষার নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নাই। তা রোমক বর্ণমালাতেই লেখা হয়) লেখা উর্দুকে। পাঞ্জাবি বা বালুচি এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের (বর্তমান পাখতুনিয়া) পাঠানরা বিরাট সংখ্যায় চাকরি করেছেন বৃটিশ ভারতের সেনাবাহিনীতে। এই কারণে তাদের শিখতে হয় উর্দু। বৃটিশ শাসনামলে যেসব সাহেব এদেশে সরকারি চাকরি করতে আসতেন, তাদেরও শিখতে হতো রোমান উর্দু। রোমান উর্দু শিখবার ব্যবস্থা ছিল অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, লন্ডন ও ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাঙালি মুসলমান সেনাবাহিনীতে চাকরি করতে যাননি। তাই শেখেননি রোমান উর্দু। না হলে তাদেরও শিখতে হতো রোমান উর্দু। আর তাদের উপর পড়তে পারতো উর্দু ভাষার একটা প্রভাব। কিন্তু সেটা পড়তে পারেনি ঐতিহাসিক কারণেই। অন্যদিকে যেহেতু বাংলা হয়ে দাঁড়ায় স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম, তাই বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই শিখেছেন একইভাবে বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষার প্রভাব তাদের উপর পড়েছে প্রায় সমভাবে। অবশ্য মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার হার ছিল খুবই কম। কিন্তু যারা শিক্ষিত হয়েছিলেন, তারা সবাই জানতেন বাংলা গদ্য লিখতে ও পড়তে। বাংলা সবাই লিখেছেন একই বর্ণমালায়। সৃষ্টি হয়নি তাই বর্ণমালার বিরোধ। উর্দুকে যখন পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করবার প্রস্তাব উঠে, তখন পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ থেকে কোনো প্রতিবাদ উঠে না। কেননা তারা মানসিক প্রকর্ষের ভাষা হিসেবে আগেই গ্রহণ করেছিলেন উর্দুকে। এছাড়া শিখেছিলেন ফৌজে চাকরি করবার জন্য রোমান উর্দু। কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে প্রতিবাদ ওঠে। কেননা পূর্ববাংলার (পূর্ব বাংলা প্রদেশকে সরকারিভাবে পূর্ব পাকিস্তান বলা শুরু হয় ১৯৫৫ সাল থেকে, তার আগে বলা হতো পূর্ববঙ্গ প্রদেশ) বাংলাভাষী মুসলমানরা মনে করেন, তারা যেহেতু উর্দুভাষী নন, অথবা উর্দু তাদের মানসিক প্রকর্ষের ভাষা নয়, তাই তারা পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের এবং উর্দুভাষী মুসলমানদের সঙ্গে উর্দুভাষায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে ভালো করতে পারবেন না। বড় বড় চাকরি পাবেন উর্দুভাষী এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা। পূর্ব বাংলার মানুষ শেষ পর্যন্ত হয়ে পড়বেন তাদেরই শাসনাধীন। পূর্ববাংলার মানুষ হয়ে পড়বেন নিজভূমে পরবাসী। পাকিস্তান হওয়ার পর, সারা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি দাঁড়ায় বাংলাভাষী জনসমষ্টি। বাংলার পাট, চা, ছাগ-চর্ম রপ্তানি করে অর্জিত হতে থাকে পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার অধিকাংশ। বাংলাভাষী মুসলমান তাই শক্ত ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে দাবি করতে পারেন, বাংলাকে দিতে হবে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা একটি না হয়ে হতে হবে দুটি। অন্যদিকে, ভারতে হিন্দিভাষী মানুষ হন অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষের

তুলনায় অনেক অধিক। তারা হয়ে দাঁড়ান ভাষার দিক থেকে প্রথম স্থানের অধিকারী। দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হন তেলুগুভাষীরা। আর তৃতীয় স্থানে আসেন বাংলাভাষীরা। তাদের বাংলা ভাষা নিয়ে আন্দোলন করবার ভিত্তি ছিল না। ছিল না মনমানসিকতা। ভারতে তাই উঠেনি বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করবার দাবি। কিন্তু ভারতেও বাস্তব ক্ষেত্রে একমাত্র হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করে তোলা যায়নি। বাস্তবে রাষ্ট্রভাষা এখনও হয়ে আছে ইংরেজি। যেমন ছিল বৃটিশ শাসনামলে। তাই সেখানে জাগছে না ভাষা নিয়ে সংঘাত। না হলে সেখানেও ভাষা নিয়ে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠতো।

এবারে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আমার নিজের জ্ঞান থেকে কিছু আলোচনা করবো। ১৯৪৮ সালে রাজশাহী সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন ড. এনামুল হক। ইনি তখনই ছিলেন একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবিতে এমএ পাস করবার পর ঝোঁকেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণার প্রতি। এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ একত্রে লেখেন 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' নামে বই। যা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। এই বই পড়ে প্রথমে জানা সম্ভব হয় মহাকবি আলাওল, দৌলত কাজী এবং কোরেশী মাগন ঠাকুর সম্বন্ধে। আরাকানের রাজারা বাংলা জানতেন এবং বুঝতেন। তাদের রাজসভায় ছিল বাংলা সাহিত্যের কদর। আরাকানে তাই হতে পেরেছিল বাংলা সাহিত্যের চর্চা। যে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আগে ছিল না। এসব কবিরা যে বাংলা লিখেছেন, তাতে নেই কোনো আঞ্চলিকতার ছাপ। এরা যে বাংলা লিখেছেন, তা সকলের বোধগম্য এবং সাধারণ মান্য বাংলা ভাষা। অথচ চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলা এ থেকে অনেক ভিন্ন। আরাকানের উত্তরাঞ্চলে চট্টগ্রামের অঞ্চলিক বাংলা ভাষাই প্রচলিত। আর দক্ষিণে প্রচলিত বর্মী বা ম্রনমা ভাষার একটি উপভাষা। কেবল আরাকানের রাজসভাতেই হতে পেরেছে এরকম বাংলার অনুশীলন। এটা যথেষ্ট বিস্ময়কর ব্যাপার। যে সম্পর্কে আমরা প্রথম অবগত হতে পারি উপর্যুক্ত গ্রন্থ থেকে। এনামুল হক সাহেব ১৯৪৮ সালে রাজশাহীতে এক ছাত্রসভায় বলেন, মুসলমানের ভাষা বলতে যদি প্রকৃত কোনো ভাষাকে ধরতে হয়, তবে বলতে হবে সেটা হলো আল-কুরআনের ভাষা। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা তাই উর্দু না হয়ে হওয়া উচিত আল-কুরআনের আরবি। পরে তাঁর কাছের লোকদের কাছে শুনেছিলাম, তিনি এটা বলেছেন কেবল উর্দুর দাবিকে ঠেকাবার লক্ষ্যে, অন্য আর কোনো কারণে নয়। ১৯৪৮ সালে রাজশাহী সরকারি কলেজে বাংলা বিভাগে মুহাম্মদ আবদুল হাই ছিলেন প্রভাষক। রাজশাহী তাঁর কাছে কোনো অপরিচিত জায়গা ছিল না। কেননা তিনি ছিলেন রাজশাহী সরকারি মাদরাসার ছাত্র। তাঁর ছাত্র-জীবনের একটা অংশ কেটেছিল রাজশাহী শহরে। তিনি মাদরাসার ছাত্র হয়েও পরে পড়েছিলেন বাংলা। হয়েছিলেন বাংলার অধ্যাপক। এ সময় তিনি যথেষ্ট খ্যাতিমান ছিলেন না। তবে তিনি ছিলেন যথেষ্ট জ্ঞানী। ছাত্ররা তাঁকে পছন্দ করত। রাজশাহী কলেজের অধ্যাপক থাকার

সময় তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের লেখা The Historical Role of Islam নামক বইটির বঙ্গানুবাদ করেন। যার একটা প্রভাব পড়েছিল কিছু কিছু ছাত্রের ওপর। তিনি পরে খ্যাতিমান হন বাংলা ভাষার ধ্বনি নিয়ে গবেষণা করে। তাঁর লেখা গ্রন্থ *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*। তিনি ১৯৪৮ সালে রাজশাহী কলেজের এক ছাত্রসভায় বক্তৃতা করেন। বলেন, বাংলা একটা খুব উন্নত ভাষা। বাংলা ভাষার মতো ভাষা যেকোনো দেশের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করতে পারে। তিনি অবশ্য সরাসরি বলেন না, বাংলাকে করতে হবে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু তুলে ধরতে চান বাংলা ভাষার যোগ্যতাকে।

বাংলা ভাষা আন্দোলন কেবল ছাত্রদের আন্দোলন ছিল না; এরমূলে ছিল শিক্ষকদেরও অবদান। আমি তাই আমার জানা উপর্যুক্ত দুই শিক্ষকের কথা বললাম। রাজশাহী কলেজে ১৯৪৮ সালের বিএ ক্লাসে পড়তেন মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (শেলী), এসএ বারী, এ টি মোহাম্মদ সুলতান। এঁরা তিনজন ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনে পালন করেছিলেন বিশেষ ভূমিকা। এক ছাত্রসভায় মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেছিলেন যে, তিনি জিন্নাহ সাহেবের দেয়া যুক্তি মানতে পারেন না। কেননা একটি রাষ্ট্রের দুটি রাষ্ট্রভাষা থাকতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হলো মাত্র একটি। কিন্তু তার লাগোয়া কানাডার রাষ্ট্রভাষা হলো দুইটি, ইংরেজি ও ফরাসি। একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা কী হবে, তা নির্ভর করে তার ঐতিহাসিক বাস্তবতার ওপর। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ভাবতে হবে এর বাস্তব অবস্থা। সে সময় জিন্নাহ সাহেব সম্পর্কে এরকম মন্তব্য করতে গেলে প্রয়োজন হতো যথেষ্ট সাহসের। কেননা, ছাত্র সমাজে ছিল জিন্নাহ সাহেবের প্রচুর ভক্ত এবং তারা হতে পারতো ক্ষুব্ধ।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, এসএ বারী, এ টি মুহাম্মদ সুলতান এরা তিনজন রাজশাহী কলেজ থেকে বিএ পাস করবার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এমএ পড়তে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে এঁরা তিনজন পালন করেছিলেন বিরোচিত ভূমিকা। এঁরা হয়ে আছেন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে অবিচ্ছেদ্য অংশ। ২১ ফেব্রুয়ারি গুলি চলবার পর রাজশাহী সরকারি কলেজের ছাত্ররা রাতের আঁধারে লণ্ঠন জ্বালিয়ে কলেজ হোস্টেলের মাঠে কাদা দিয়ে ইট গেঁথে বানিয়েছিলেন প্রথম শহীদ মিনার। পরের দিন পুলিশ এসে তা ভেঙে দেয়। সে সময় রাজশাহী কলেজে পড়তে আসতেন অনেক জায়গা থেকে ছাত্র। রাজশাহী কলেজ থেকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মন্ত্র ছড়িয়ে পড়েছিল অন্য আরও অনেক জেলায় এবং গ্রামে ও গঞ্জে।

আমার মনে পড়ে, আমার এক সহপাঠী আমাকে বলেছিলেন, বাংলা ভাষা হলো হিন্দুর ভাষা। এটা নিয়ে আমাদের আন্দোলন করা ঠিক হচ্ছে না। আমি তাকে বলেছিলাম, বাংলা হিন্দুর ভাষা হলে আমরা এ ভাষাতে কথা বলি কেন? কেন কী কারণে আমরা শিখলাম এই ভাষা। বাংলাভাষী জনসমষ্টির মধ্যে এখন হিন্দুর চাইতে মুসলমানের

সংখ্যাইতো হতে দেখা যাচ্ছে বেশি। আমার সহপাঠির মতো রাজশাহীতে অনেকে বিশ্বাস করতেন যে, বাংলা হলো হিন্দুর ভাষা। আর তারা অনুভব করতেন উর্দুর প্রতি একটা টান। কিন্তু এই টানটা চলে যেতে থাকে একটি বিশেষ কারণে। রাজশাহীতে বাইরে থেকে আসা উর্দুভাষী মুসলমান স্থানীয় মুসলমানদের সঙ্গে করতে থাকেন রূঢ় ব্যবহার। করতে থাকেন তাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য। উর্দুভাষীদের সঙ্গে তাই জেগে উঠে স্থানীয় মুসলমানদের একটি বিরোধপূর্ণ মনোভাব। সৃষ্টি করে একটা স্বাতন্ত্র্যের চেতনা। যেটা শক্তি যোগায় রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন একটা বিফল আন্দোলন ছিল না। বাংলা হতে পেরেছিল সাবেক পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। বর্তমান পাকিস্তানে বাইরে থেকে যাওয়া উর্দু ভাষী মুসলমানরা হয়ে উঠেছেন একটা বড় রকমের সমস্যা। তারা দাবি করছেন, মহাজিরদের জন্য পাকিস্তানে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ। সেখানে সৃষ্টি হতে পেরেছে মহাজির কৌমি মুভমেন্ট (M. Q. M)। পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে অনেক লোক জীবিকার অন্বেষণে গিয়েছিলেন তদানীন্তন পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে। এখন পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যাওয়া মানুষ ও তাদের সন্তানসন্ততি মিলে পাকিস্তানে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৫ লক্ষ। কিন্তু এদের সাথে স্থানীয় জনসমষ্টির সৃষ্টি হচ্ছে না সংঘাত। যেমন সংঘাত সৃষ্টি হতে পেরেছে বাইরে থেকে যাওয়া উর্দুভাষীর সঙ্গে। বাংলাভাষী মানুষ শিখেছেন স্থানীয় লোকের ভাষা। খেটে খাচ্ছেন ক্ষেতে খামারে। অনেকে হয়েছেন মসজিদের ইমাম। এদের অনেকেই বিবাহ করেছেন স্থানীয় কন্যাদের। ফলে সৃষ্টি হতে পেরেছে একটা আত্মীয়তার বন্ধন। গড়ে উঠেছে স্বজন ভাব। এসব নিয়ে কথা হচ্ছিল আমার এক প্রাক্তন ছাত্রের সঙ্গে। যে এখন থাকে পাকিস্তানের পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডিতে। সে রাজশাহী এসেছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে প্রাক্তন ছাত্রদের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে (Golden Jubilee and Alumni Reunion, 22- 23 January 2016) আমন্ত্রিত হয়ে। সে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। শুনলাম তার মুখ থেকে পাকিস্তানে এদেশে থেকে যাওয়া মানুষের হাল হকিকত।

বাংলা ভাষা নিয়ে আমরা অনেক কথা বলছি। কিন্তু বাংলা ভাষায় এখন নেই উন্নতমানের যথেষ্ট পাঠ্যপুস্তক। উঁচু ক্লাসে তাই ছাত্র পড়াতে দেখা দিচ্ছে অসুবিধা। এই অসুবিধা কাটাবার জন্য বিদ্যার নানা শাখায় অন্যভাষায় রচিত উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়া প্রয়োজন। উন্নত পাঠ্যপুস্তক ছাড়া শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে না। আমাদের অনেকেই বলছেন, বাংলা ভাষার কদর বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি ভাষার কদর বাড়ে দুইটি কারণে। ভাবের বাহন ভাষা। কোনো ভাষা যদি হয় ভাব সম্পন্ন, তবে ভিন্নভাষীরা ঐ ভাষা শিখতে চান ভাবের আকর্ষণে। একটি ভাষার মর্যদা বাড়ে আর্থিক কারণেও। কেবল ভাবের কারণে নয়। ইংরেজি ভাষার কদর এক সময় বেড়েছে, বিশ্ব-বাণিজ্য চলেছে বৃটিশ মুদ্রা পাউন্ডের মাধ্যমে। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে অন্য জাতি শিখতে

বাধ্য হয়েছে ইংরেজি ভাষা। এখন মার্কিন ডলার হয়ে উঠেছে সবচেয়ে ক্রয় ক্ষমতাসম্পন্ন। ডলারের মাধ্যমে হচ্ছে বিশ্ব-বাণিজ্য। অন্যজাতি ইংরেজি ভাষা শিখছে কেবল ভাবগত কারণে নয়, বাণিজ্যিক প্রয়োজনে। কোনো জাতি যদি অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে, তবে তার ভাষার কদরও কমে। এখন যে ইংরেজির কদর বেড়েছে, সেটা আর ইংরেজের ইংরেজি নয়, মার্কিন ইংরেজি। আমরা যদি আমাদের ভাষার কদর বাড়াতে চাই, তবে আর্থিক দিকে থেকে আমাদেরও হতে হবে সম্পদশালী। একটি জাতি বড় না হলে, তার ভাষা মর্যাদা পায় না। আর জাতির বড় হওয়া নির্ভর করে তার আর্থিক সমৃদ্ধির উপর। একটা জিনিস লক্ষ করে আমি কিছুটা শঙ্কিত হচ্ছি। তা হলো ইংরেজি ভাষার প্রতি আমাদের অনীহা। ইংরেজি ভাষায় প্রতি বছর বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যত গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে, অন্য ভাষায় তা হচ্ছে না। ইংরেজি ভাষায় প্রতিবছর প্রকাশিত হয় সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক পত্র পত্রিকা। আমরা যদি ইংরেজি ভাষা না শিখি, অন্তত পড়ে বুঝবার মতো দক্ষতা না অর্জন করি, তবে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে যেতেই থাকব আর হব ক্ষতিগ্রস্ত।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ছিল একটা রাজনৈতিক আন্দোলন। কিন্তু কেবল রাজনীতি করে কোনো জাতি টিকে থাকতে পারে না। তাকে করে-কর্মে খেতে হয়। তার জন্য তাকে অর্জন করতে হয় জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা। অন্য জাতির কাছ থেকে আহরণ করতে হয় নতুন প্রযুক্তি। এর জন্য শিখতে হয় অন্যের ভাষা। আমরা যদি ভাবি অন্যের ভাষা শিখব না, একমাত্র মাতৃভাষাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তবে সেটা বাস্তবতা সম্পন্ন হবে না। আমাদের শিখতে হবে অন্য ভাষাও। কেননা, অন্যভাষার কাছ থেকেও আমাদের আহরণ করতে হবে জ্ঞান ও কৃতকৌশল। দেশে দেশে আমরা বানাচ্ছি শহিদ মিনার। ইউনেস্কো থেকে ১৯৯৯ সালে একুশে ফেব্রুয়ারিকে করা হয়েছে আন্তার্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। কিন্তু কয়টি দেশ এই দিবস পালন করছে আমি তা জানি না। আমি শহিদ মিনার গড়বার বিরুদ্ধে নই। বিরুদ্ধে নই শহিদদের স্মৃতিচারণে। কিন্তু মনে করি না, এর দ্বারা ভাষার কোনো উন্নতি হবে বলে। বাংলা ভাষা যতটা রস-সাহিত্য রচনার ভাষা হতে পেরেছে, জ্ঞানপ্রদ গ্রন্থ রচনার ভাষা সে পরিমাণে হতে পারেনি। এই ঘাটতিকে পূরণ করতে হবে।